Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501072 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Prashant Kumar, author of 'Rabi Jiboni': An introvert humourist
'রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার: এক অন্তর্মুখী রসসাধক

Dr. Suchetana Das
Independent Researcher
Purba Medinipur
West Bengal

Received on: 14th June 2026
Accepted on: 28th June 2026

Abstract:
Among Bengali biographers of Rabindranath, the name of Prashantakumar Pal — author of 'Rabijibani'— naturally comes to mind immediately after that of Prabhatkumar Mukhopadhyay, the author of 'Rabindrajibani'. Upon reading the nine-volume, unfinished 'Rabijibani', a reader generally perceives Prashantakumar as a dedicated seeker of facts, possessing superhuman — and literally unparalleled — skill in sourcing, extracting, selecting, and arranging information. It is primarily due to his efforts that the biography of Rabindranath has been presented to readers and researchers as such a meticulously detailed repository of facts. Yet, at the same time — and particularly when compared to his predecessor Prabhatkumar — 'Rabijibani' is not quite as engaging or emotionally resonant, largely due to a deliberate avoidance of analysis. In short, its appeal to the reader's intellect is far stronger than its appeal to the heart. However, while this initial impression holds true, it is not the whole truth; beneath the arid layers of factual data flows a hidden, subterranean stream — a current of profound insight steeped in touching human emotion — which often eludes the reader during a first reading. While Prashantakumar is widely acclaimed as a wizard of facts, the aim of this article is to reveal the full portrait of this lesser-known connoisseur of emotional depth by tracing the introspective footprints he left within the pages of 'Rabijibani'.

Key Words:
Rabindranath, Biography, 'Rabijibani', Prashantakumar Pal, Chronicler of Facts, Aesthetic Sensibility.

মূল প্রবন্ধ

রবীন্দ্র-যুগের প্রায় শতবর্ষ পার করেও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল এক অন্যতম প্রাণকেন্দ্র, তেমনি বাংলা জীবনীসাহিত্যের পরিসরেও প্রকারভেদের বৈচিত্রে, সংখ্যাগত সমৃদ্ধিতে এবং মানগত উৎকর্ষের মাপকাঠিতে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ স্থানটি দখল করে রয়েছে রবীন্দ্রজীবনী। এই ক্ষেত্রটিতে আজ অবধি যত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে, তার মধ্যে সর্বপ্রথম সারিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'র পাশাপাশি অবশ্যই থাকবে প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী'।

© Santiniketan Sahityapath

রবীন্দ্রজীবনীর পাঠকমাত্রেই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, বিভিন্ন দিক থেকে 'রবীন্দ্রজীবনী' এবং 'রবিজীবনী' একে অপরের পরিপূরক। এই পরিপূরণ বহুবিধ। একদিকে, তা পরিসরগত। যেখানে 'রবীন্দ্রজীবনী'তে চারটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের আট দশকব্যাপী সমগ্র জীবন-পরিসরটিকেই ধরা হয়েছে, সেখানে 'রবিজীবনী' কিন্তু পাঠকের দুর্ভাগ্যবশত জীবনীকারের প্রয়াণের ফলে নয়টি খণ্ডে ১৯২৬ সালের রবীন্দ্র-জীবনের বিবরণ অবধি এগিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আবার অন্যদিক থেকে এই পরিপূরণ উত্তরসূরি জীবনীকারের সচেতন ও ঘোষিত নীতিগতও বটে। দুই জীবনীকারই জীবনীর সাধারণ রীতি অনুযায়ী কালানুক্রমিকতা মেনে রবীন্দ্রজীবনের ধারাটিকে অনুসরণ করে গেলেও বিবরণদানের ধরন, উদ্দেশ্য ও শৈলির দিক থেকে হয়ে ওঠেন একে অপরের বিপরীতমুখী। অর্থাৎ প্রভাতকুমার যেখানে প্রতিপদে রবীন্দ্র-জীবন-সাহিত্য ও দর্শনের গভীর বিশ্লেষণে ডুব দিয়ে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসন্ধানে উন্মুখ, সেখানে উত্তরসূরি প্রশান্তকুমার স্পষ্টতই তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে পাঠককে জানিয়ে দেন যে, 'রবীন্দ্রজীবনী'-সহ সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে এতদ্যাবৎ 'অপ্রকাশিত ও অব্যবহৃত তথ্যের'[১] ফাঁকপূরণ করাই 'রবিজীবনী'র অন্যতম লক্ষ্যবিন্দু (Focal Point) ফলে, পাঠকের ঝুলিতে একদিকে প্রশান্তকুমারের সহায়তায় যেমন জমা পড়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যাদি, অন্যদিকে প্রভাতকুমারের দিকনির্দেশনায় সেই তথ্য পূর্ণতা পায় যথাযথ তাৎপর্য বিশ্লেষণের ঋদ্ধতায়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই প্রবন্ধের আলোচ্য কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তথা প্রশান্তকুমার পাল ও তাঁর কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন তাঁর পূর্বসূরি তথা প্রথম বাংলা রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে এই আলোচনা শুরু করা হলো। আসলে, পাঠকমহলে প্রশান্তকুমারের 'রবিজীবনী' সম্পর্কে 'বিশ্লেষণবিমুখ, একান্ত তথ্যমুখী, এমনকি তথ্যসর্বস্ব এবং সেকারণেই কিছুটা নীরস এবং নৈর্ব্যক্তিক' — এ জাতীয় যে সাধারণ ধারণাটি প্রচলিত রয়েছে এবং যা অনেকাংশে স্বয়ং লেখক-সমর্থিতও বটে, তার কারণটিই কোথাও প্রশান্তকুমারের নিজের 'রবীন্দ্রজীবনী'র পাঠপ্রতিক্রিয়াজাত। প্রশান্তকুমার তাঁর গ্রন্থের ন'টি খণ্ডের বিভিন্ন প্রসঙ্গান্তরে জীবনীকার হিসেবে তাঁর যে অবস্থান বারংবার ঘোষণা করেছেন, তা স্পষ্টতই পূর্বসূরির আদর্শের বিপ্রতীপে স্থাপিত — অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্র-জীবন-সাহিত্য ও দর্শনের ব্যাখ্যাদান বা গভীরে ঢুকে বিশ্লেষণ বা রসবিচারকে একান্তই তাঁর ক্ষেত্রবহির্ভূত হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং রবীন্দ্রজীবনের একটি 'তথ্যগত রূপরেখা অঙ্কন'[২]কেই মূল লক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এই নীতি যে কার্যক্ষেত্রেও প্রশান্তকুমার একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে বরাবর অনুসরণ করে গেছেন, তা যেকোনো 'রবিজীবনী' পাঠকই নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন। ফলত, প্রশান্তকুমারের অসামান্য বৈদগ্ধ্য, সম্ভব-অসম্ভব সব সূত্র থেকে যথাসম্ভব অধিক তথ্যনিষ্কাশন করে নেওয়ার ব্যতিক্রমী দক্ষতা এবং সুদীর্ঘ কালব্যাপী তথা আমৃত্যু অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহনপূর্বক রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে একটি অমূল্য আকর হয়ে উঠলেও 'রবিজীবনী' যে সাধারণ পাঠের নিরিখে কিয়দংশে তথ্যভারাক্রান্ত, একটু হয়তো বেশিই নৈর্ব্যক্তিক ও নিয়ম-শৃঙ্খলিত বলে অনুভূত হয়, বিশেষত পূর্বসূরি 'রবীন্দ্রজীবনী'র তুলনায়, তা বোধহয় অস্বীকার করার জায়গা নেই।

'রবিজীবনী'র এই সাধারণ পাঠ-অভিজ্ঞতার পটভূমিকে পশ্চাৎপটে রেখে আমরা এবার ঢুকে পড়তে পারি বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচনায়। 'রবিজীবনী'কারের যে একনিষ্ঠ তথ্যসাধকসুলভ নীরস-কঠোর ভাবমূর্তি পাঠক-মানসে আপাতভাবে প্রতিফলিত হয় এবং বারংবার লিখিতভাবে নীতি-ঘোষণা ও অনুসরণের মাধ্যমে জীবনীকার নিজেও যাকে প্রতিষ্ঠা দিতে অত্যন্ত আগ্রহী; নিবিড় পাঠের ফলে দেখা যায়, তার আড়াল থেকে হয়তো নিজের অজান্তেই বারেবারে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ করে ফেলেন সংবেদী-রসগ্রাহী-রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুভবী পাঠক এক অন্যতর প্রশান্তকুমার এবং 'রবিজীবনী'র ন'টি খণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সূত্র ধরে তাঁকেই এই প্রবন্ধে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা।

আমরা জানি, "সর্বদা সচেতনভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের রস-বিশ্লেষণকে লক্ষ্যের বহির্ভূত"[৩] রাখাই ছিল প্রশান্তকুমারের প্রাথমিক নীতি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সংকল্প আগাগোড়া কঠোরভাবে রক্ষা করতে পারেন নি তিনি, কারণ তাঁর রচিত জীবনীর কেন্দ্রীয় মানুষটি আর কেউ নন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রস-সাধক রবীন্দ্রনাথ। তাই দেখা যায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনীকারের নিস্পৃহ খোলস ভেদ করে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' পাঠক প্রশান্তকুমার। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যাক, যেখানে একনাগাড়ে তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনের একঘেয়েমি দূর করেছে উপলব্ধিজাত রসের স্নিগ্ধ ছোঁয়া —

'পোস্টমাস্টার' প্রসঙ্গে —

© Santiniketan Sahityapath

"গল্পটিতে এইটুকুই বাস্তব, বাকিটুকু কল্পনা — কিন্তু সেই কল্পনার কারিগরিতে বাস্তব পোস্টমাস্টারকে অতিক্রম করে কল্পনার রতন চরিত্রটি তার নীরব বেদনা নিয়ে রসসর্গলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে।"[৪]

'চিত্রাঙ্গাদা'-প্রসঙ্গে —

"... যে 'আনন্দিত অবকাশ'-এর মধ্যে চিত্রাঙ্গাদা লেখা, সেই অবকাশ গীতিকাব্যের অনুকূল — চিত্রাঙ্গাদা-র মধ্যে সেই গীতিকাব্যের আবহ বর্তমান; একটি সৌন্দর্যস্বপ্ন যেন মহাভারতের একটি কাহিনি অবলম্বনে নাট্য-সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।"[৫]

'স্নেহস্মৃতি', 'নববর্ষে', 'দুঃসময়' প্রভৃতি কবিতা ও গান সম্পর্কে —

"লক্ষণীয়, কাদম্বরী দেবীর বিষপানের সেই চরম দিনটিতে কীর্তনের সুরে রবীন্দ্রনাথ এই বেদনা-গাথা সমাপ্ত করেছেন। এরপর 'মনে তার নিত্য আসা যাওয়া'।"[৬]

এ প্রসঙ্গে অন্য ধরনের একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক — ১ আশ্বিন, ১৩১৬য় 'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর' গান রচনা এবং একই দিনে ক্যাশবইয়ে রথীন্দ্রনাথের নামে পনেরো বছরের জন্য চল্লিশ হাজার টাকার বিমা করানোর হিসেব — অর্থাৎ, একদিকে 'গীতাঞ্জলি'র ভগবৎ-মুখী গান রচনা, এবং অন্যদিকে বৈষয়িক ও কর্তব্যপরায়ণ পিতৃসত্তা — এই দুই আপাত-বৈপরীত্য কীভাবে মিলে যায় জীবনীকারের দৃষ্টিতে এবং বোঝা যায় 'রবিজীবনী' নিছক বহির্তথ্যের সংকলন নয়, আসলে তা কোথাও তথ্যের সমন্বয়ে অন্তর্সত্যেরই অনুসন্ধান — "এই দুটি তথ্যকে মিলিয়ে দেখলে গানটির জন্মলগ্নের একটি সূত্রের সন্ধান মেলে — সদ্য আমেরিকা-প্রত্যাগত সাংসারিক জীবনে প্রবেশন্মুখ রথীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাবিধানে স্ত্রী-কন্যা-পুত্রের বিয়োগবিধুর মানুষটির মন আশানিরাশার রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, এই ভাবনাটি মনে আনলে ব্রহ্মসংগীতটির ঈশ্বরাভিমুখী বোধটি ব্যক্তিগত মাত্রা লাভ করে।"[৭]

এবার দেখে নেওয়া যাক, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও দর্শনের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জীবনীকারের ভূমিকা। গ্রন্থের প্রারম্ভিক মুখবন্ধেই প্রশান্তকুমার জানিয়ে দেন — 'রবীন্দ্রসাহিত্যের রস-বিশ্লেষণ'কে জীবনীকারের দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন না, তা একান্তই 'রসজ্ঞ সমালোচকের'[৮] কাজ। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, রবীন্দ্র-জীবনে সাহিত্য ও দর্শনের পরিধি যত ব্যাপক হারে প্রসারিত ও গভীর হতে থাকে, জীবনীকারও তার অমোঘ টানে ক্রমশ 'তত্ত্ব ও রসের নিষিদ্ধ জগতে'[৯] পদার্পণ করতে বাধ্য হন। এতে এক শ্রেণির পাঠকের অসন্তোষ সম্পর্কে অবগত থাকলেও জীবনীকারকে রবীন্দ্র-সাহিত্য-দর্শন ও জীবনবোধের ক্রমশ গভীরে ডুব দিতেই লক্ষ করা যায় — 'ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত'[১০] হওয়ার সংকল্প আগাগোড়া অটুট থাকেনি।

এই ক্রমবিবর্তনের ধারাটি মাথায় রেখে 'রবিজীবনী'তে রবীন্দ্র-সাহিত্য-দর্শন মূল্যায়নের কয়েকটি বিশেষ দিক আমরা তুলে ধরব, যার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক সংকল্প ও তার বিচ্যুতি-বিবর্তন মিলিয়ে নিছক তথ্যানুসন্ধানীর প্রচলিত ভাবমূর্তিকে ছাপিয়ে প্রশান্তকুমার সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

ক) অভ্যন্তরীণ প্রমাণ (Internal Evidence) —

বহুক্ষেত্রে সঠিক তথ্যে পৌঁছানোর জন্যই জীবনীকারকে তাঁর ঘোষিত নীতিবিরুদ্ধভাবে সাহিত্যিক রস-শৈলী বিশ্লেষণের আশ্রয় নিতে দেখি। ভাব-বিষয়-ভাষা ও ভঙ্গিগত সাদৃশ্যের জেরে তিনি বহু অ-চিহ্নিত রচনাকে রবীন্দ্র-রচনা বলে চিহ্নিত করেন, যেমন —

'বিজ্ঞান চিন্তা/কল্পনা' (ফাল্গুন, ১২৮৪, ভারতী, রচয়িতা জনৈক 'বিধবা' বলে রচনায় উল্লেখিত) সম্পর্কে — "আমাদের ধারণা, প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের রচনা।... সমকালীন রবীন্দ্র মানসিকতার সঙ্গে এই প্রবন্ধের ভাব-সাদৃশ্য সুপ্রচুর, তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্যও এর প্রতি ছত্রে দেখতে পাওয়া যায়।"[১১]

'নি[ঃ]স্বার্থ প্রেম' (কার্তিক, ১২৮৭, ভারতী) সম্পর্কে — "চলিত ভাষায় য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রের ঢঙে লেখা এই পত্র-প্রবন্ধটি এতদিন কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও, আমাদের ধারণা এটি রবীন্দ্রনাথের রচিত।"[১২] খেয়াল করবো, ভাষা ও ভঙ্গিগত

© Santiniketan Sahityapath

সাদৃশ্য ছাড়াও, ‘ভা-’ সাক্ষরের ব্যবহার, অন্তর্নিহিত ভাব-বিশ্লেষণে “ভগ্নহৃদয় কাব্য কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গ করার জন্য খানিকটা আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাব” ও “রবীন্দ্রনাথে বয়ঃসন্ধিকালের প্রেমচেতনা” র সঙ্গে সাদৃশ্যপ্রাপ্তি উক্ত সিদ্ধান্তের কারণ।[১৩]

বিপরীতক্রমে, অভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাপেক্ষেই ‘সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়’ (মাঘ, ১২৮৮ ভারতী) প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের নয় বলে মনে করেন — “... প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রজীবনী-কার রবীন্দ্রনাথের লেখা ধরে নিয়ে আলোচনা করেছেন... প্রবন্ধটির বিষয়, বিন্যাস-পদ্ধতি, ভাষা এবং বিশেষত যে-তিনটি কাব্যাংশ রচনাটির মধ্যে রয়েছে, সেগুলি বিচার করলে এটিকে কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে ভাবা যায় না, বরং মনে হয় এটি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা।”[১৪]

এভাবে কোথাও পাদটীকার ভাষাতাত্ত্বিক ইঙ্গিত, কোথাও বা মুদ্রাদোষের ভিত্তিতে প্রশান্তকুমার রবীন্দ্র-রচনাগুলিকে চিহ্নিত করেন। পাশাপাশি, রচনার অভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে রচনাকাল সম্পর্কেও সিদ্ধান্তে আসেন জীবনীকার। যেমন — ‘জীবনস্মৃতি’র বয়ান অনুযায়ী প্রথম রচিত রবীন্দ্র-কাব্য ‘বনফুল’এর রচনাকাল যে হিমালয় থেকে ফেরার (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০) অব্যবহিত পরে নয়, বরং ১২৮২ বঙ্গাব্দের পূর্বে যে তা কোনোমতেই রচিত হতে পারে না — এই সিদ্ধান্তে জীবনীকার পৌঁছন অভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচারে ‘বনফুল’ এর উপর ‘শকুন্তলা’ (১২৮২র প্রথমদিকে পড়া) এবং সারদামঙ্গল (ভাদ্র-পৌষ, ১২৮১, আর্য্যদর্শন) কাব্যের গভীর পাঠ-প্রভাব লক্ষ করেই।[১৫]

• ‘শ্রীচরণেষু’ ও ‘চিরঞ্জীবেষু’ (চৈত্র, ১২৯২, বালক) সম্পর্কে — “এই পত্র-প্রবন্ধ দুটি সম্ভবত পৌষ-মাঘ মাসের কোনো সময়ে রচিত, কারণ দুটিরই মধ্যে যে প্রসন্ন উদার আশাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে, ফাল্গুন-চৈত্রের তিক্ত তির্যক ও ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের সঙ্গে তার বিরাট পার্থক্য দেখা যায়।”[১৬]

খ) সাহিত্য-আলোচনা — “সাহিত্য-আলোচনা আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত”[১৭] — প্রাথমিকভাবে সংকল্পিত এই নীতি জীবনীর সর্বত্র অনুসৃত হয়নি। কোথাও অসার সমালোচনার জবাবে, কোথাও বা রবীন্দ্র-জীবনদর্শনকে গভীরে গিয়ে বোঝার তাগিদ থেকে ‘রবিজীবনী’তে বহুবারই উঠে এসেছে সাহিত্য-আলোচনা। যেমন —

‘ছিন্নপত্রাবলী’ প্রসঙ্গে — ‘রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রতাবিহীন’ — এই প্রচলিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জীবনীকার চিঠিগুলির মূল সুর ও ছোটগল্পকে মিলিয়ে যে সংহত অথচ ব্যঞ্জনাগর্ভ ও রসঋদ্ধ আলোচনা করেন, তার কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করব —

১। ‘ছিন্নপত্রাবলী’তে প্রশান্তকুমার লক্ষ করেন — “গভীর অভিনিবেশ সহকারে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ ও প্রকৃতির পটভূমিকায় রেখে তার মূল্যায়ন”[১৮] এবং তিনি মনে করেন “এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের গল্পে ঘটনার ঘনঘটা কম, মানুষের সুখদুঃখ একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত লাভ করে স্বরগ্রামের নীচু সুরগুলোর মধ্যে খেলা করতে থাকে।”[১৯]

২। “... বেশীর ভাগ সময়েই রবীন্দ্রনাথের দেখা ‘গবাক্ষ-দর্শন’ — কিন্তু সেই কারণেই অন্তরের রসে জারিত হওয়ার সম্ভাবনা গভীর ভাবে দেখা দিয়েছে।”[২০]

৩। “জীবনের ‘বস্তুতন্ত্রতা’ সাহিত্যের ‘বাস্তবে’ রূপান্তরিত হওয়ার ফলেই ‘ছুটি’ বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প।”[২১]

এছাড়া ‘জীবিত ও মৃত’, ‘মহামায়া’, ‘নিশীথে’, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পপ্রসঙ্গে শ্রী প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বারংবার যে ‘প্রতারণামূলক আচরণ’ বা ‘কুম্ভীলকবৃত্তি’র অভিযোগ আনেন, তা খণ্ডনসূত্রেও বিস্তারিত সাহিত্যালোচনা করেন প্রশান্তকুমার।

‘প্রসঙ্গকথা’ (দ্বিতীয়), (আষাঢ়, ১৩০৫, ভারতী) সম্পর্কে —

১। “এটি সম্পর্কে আলোচনা দূরে থাকুক, এটির কথা কেউ উল্লেখ করেন নি। অথচ রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ, দেশীয় শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও উপযুক্ত শিল্পীদের মর্যাদাদানের জন্য তাঁর আগ্রহ রচনাটির প্রতি ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে।”[২২]

© Santiniketan Sahityapath

২। “রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনাগুলিকে আমরা উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত, কিন্তু... এগুলি রচনার সময়কাল প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রমানসেরও নির্মাণকাল, তাই কি বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সেই মনটি গঠিত হয়ে উঠছিল তার ইতিহাস বোঝার জন্য... এগুলিকে উদ্ধার করে পাঠকদের পক্ষে সহজলভ্য করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।”[২৩] এভাবেই বাহ্যিক তথ্যানুসন্ধানের নেপথ্যে কাজ করে যায় ‘রবীন্দ্র-মানস’কে উপলব্ধির তাগিদ।

‘প্রভাতসংগীত’ কাব্যালোচনা — “সন্ধ্যাসংগীত’এ রবীন্দ্রনাথের যে প্রেম-কল্পনা হৃদয়ারণ্যের অন্ধকারে পথ-হারা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, বালিকা ইন্দিরার প্রতি স্বতোৎসারিত বাৎসল্য-প্রেম তার থেকে মুক্তির একটি পথ দেখিয়েছে মনে করলে খুব ভুল হবে না। ‘প্রভাতসংগীত’ কাব্যগ্রন্থটি ইন্দিরা দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল... দশ বছরেরও কম বয়সের... একটি বালিকাকে এই গ্রন্থোৎসর্গ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে মনে হয়।”[২৪]

প্রয়োজনে জীবনীকারকে তুলনামূলক সাহিত্যালোচনাতেও অগ্রসর হতে দেখি। হাঙ্গেরিয়ান লেখক Maurus Jokai এর Eyes Like Sea র সঙ্গে রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারী-ভাবনার তুলনা করে তিনি বলেন — “চোখের বালি-র বিনোদিনী ও চতুরঙ্গ-এর দামিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ‘প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান’ নারীপ্রকৃতি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু হাঙ্গেরির সমাজের সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের গুণগত পার্থক্যের জন্য তাদের পক্ষে ‘বেসি’ [Eyes Like Sea র নারীচরিত্র] হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।”[২৫]

লক্ষ করব, যেখানেই প্রশান্তকুমার মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ অকারণ ও অমূলক সমালোচনার শিকার হয়েছেন, অথবা সাধারণের মাপকাঠিতে তাঁর আচরণ বা বক্তব্য অসংগত বা বিভ্রান্তিজনক বলে মনে হতে পারে, সেখানেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ মিতভাষী তথ্যভিত্তিক বিবরণের পরিবর্তে বিশদে রবীন্দ্র-দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখের ‘বিষোদ্গার’ ও ‘ক্লেদ নির্গমন’[২৬] মূলক সমালোচনার প্রেক্ষিতে ‘রবিজীবনী’র আলোচনাগুলি এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অনুরূপ দৃষ্টান্ত মেলে, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর বহু চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি সহকারে রবীন্দ্র-দর্শন-জীবনবোধের বিস্তৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই মৃত্যুতে তাঁর আপাত-নির্লিপ্তিকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টায়।

এবার দেখে নেওয়া যাক ‘রবিজীবনী’র ‘মানবিক’ দিক, যা গ্রন্থটিকে একটি উপযোগিতার দিক থেকে অসীম গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পাঠাভিজ্ঞতার নিরিখে নীরস, যান্ত্রিক বা ক্লান্তিকর একটি তথ্যসংকলনমাত্র হওয়ার প্রায়-অনিবার্য পরিণতি থেকে রক্ষা করেছে। উপরিস্তরে শুষ্ক তথ্যের বালুস্তরের নীচে ফল্গুস্রোতের মতোই এই জীবনীতে বয়ে চলেছে স্নিগ্ধ কৌতুকরস ও মানবীয় আবেগের এক প্রাণোচ্ছল ধারা — বস্তুত, এর জোরেই নৈর্বক্তিক নির্লিপ্তির খোলস থেকে বেরিয়ে এসে ‘রবিজীবনী’ হয়ে ওঠে জীবনীকার ও পাঠকের মধ্যে রবীন্দ্র-জীবনকে গভীরে গিয়ে উপলব্ধি করার এক স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগ-মাধ্যম।

লক্ষ করি, ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামের ভারি আবরণ সরিয়ে ভিতরের একান্ত ঘরোয়া মানুষটিকে বোঝার চেষ্টায় বিশেষ উৎসুক ও আগ্রহী ‘রবিজীবনী’কার। তাই শুধু বাহ্য-তথ্যে সন্তুষ্ট না থেকে তিনি আক্ষেপ করেন ‘ছিন্নপত্রাবলী’তে বাদ পড়া ‘তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা’গুলির জন্য — “সেগুলি থাকলে আরও কত অন্তরঙ্গভাবে আমরা ‘ব্যক্তি’ রবীন্দ্রনাথকে লাভ করতে পারতাম!”[২৭]

এই ‘ব্যক্তি’ রবীন্দ্রনাথকে খোঁজার প্রয়াস এই জীবনীতে বারবার ঘুরেফিরে আসে —

- “প্রিয়জনদের জন্য ভালোবাসা-মেশানো উদ্বেগ, পরামর্শ এবং নিখুঁত হিসাবজ্ঞান দেখে যথার্থই মনে হয় ‘কাব্য করে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো’।”[২৮]
- “মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটি অন্তরঙ্গ প্রকাশ”[২৯] হিসেবে সরলা রায়কে লেখা চিঠিটি (৮ শ্রাবণ, ১৩০০) জীবনীকার বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উদ্ধৃত করেন, কারণ — “স্নেহকাতর সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ অকুণ্ঠ প্রকাশ খুব বেশি সুলভ নয়।”[৩০]
- আষাঢ়, ১৩০৫এ অসুস্থ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের সেবা-শুশ্রূষা প্রসঙ্গে — “ ‘মানুষ’ রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রটি অতুলনীয়। নিতান্ত অপরিচিত অসুস্থ পথচারীকে ঘরে তুলে নিয়ে এসে তার সেবা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এমন ঘটনাও

© Santiniketan Sahityapath

দুর্লভ নয়।”[৩১]

‘রবিজীবনী’তে মোটের উপর নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনরীতি অনুসৃত হলেও জীবনীকারের নিজস্ব মতাদর্শ ও মূল্যায়ন প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে। বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-আদর্শের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং সমর্থন যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি সমালোচনাও করেছেন ক্ষেত্রবিশেষে। ফলত, ‘রবিজীবনী’তে যুক্ত হয়েছে একটা ব্যক্তিগত মাত্রা, যার মাধ্যমে সহজাত নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ অবস্থানকে অতিক্রম করে স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হয়েছে জীবনীকারের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রজীবনের খণ্ডভাষ্য। যেমন — ১২৯১ বঙ্গাব্দের বহু আলোচিত বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ মসীযুদ্ধ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমারের বঙ্কিমবিরোধী যুক্তির জালবিন্যাস এবং বঙ্কিম-সম্পর্কিত মন্তব্যের তীক্ষ্ণতা স্পষ্টতই এ বিতর্কে তাঁর আন্তরিক সমর্থন কোন্ পক্ষে, তা প্রকাশ করে দেয় — “দুর্বলতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের [‘আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ‘নব হিন্দু সম্প্রদায়’’ ’] অন্যত্রও লক্ষিত হয়... রবীন্দ্রনাথ কথিত ‘একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা’ শব্দগুলিকে ‘একটি আদর্শ হিন্দুর কল্পনা’-তে রূপান্তর ও তদনুযায়ী যুক্তিপ্রয়োগ, অনুচিত ইঙ্গিত... তাঁর মর্যাদাবোধের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ বলে মনে হয় না। বস্তুত এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের পিছনে একটি ‘বড় ছায়া’ দেখা যায়... গুরু ও প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করলে এই ভবিতব্য এড়ানো প্রায়শই সম্ভব হয় না।”[৩২]

জীবনীকারের নিজস্ব মতাদর্শ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনায়। যেমন ‘প্রসঙ্গকথা’ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫, ভারতী) সম্পর্কে — “উল্লেখ করা দরকার, রবীন্দ্রনাথ যখন এই-সব প্রবন্ধ লিখছেন তখন সিডিশন বিল আইনে পরিণত হয়েছে এবং পেশাদারী রাজনীতিকদের মার্জার-ধ্বনির পাশাপাশি এই ‘কবি-কণ্ঠ’ একেবারেই অন্যরকম লাগার কথা।”[৩৩]

আবার, মহাত্মা গান্ধীর চরকা-সংক্রান্ত “অযৌক্তিক জবরদস্তির বিরোধী সমালোচনা” মূলক রবীন্দ্র-প্রবন্ধ ‘চরকা’ (ভাদ্র, ১৩৩২, সবুজ পত্র), আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রভূত সমালোচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে জীবনীকারের মন্তব্য — “এই কর্তাভজার দেশে গান্ধীজির এইসব অন্যায় প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানোর সৎসাহস দেশের মধ্যে কেবল রবীন্দ্রনাথেরই ছিল।”[৩৪]

তা সত্ত্বেও, রবীন্দ্র-প্রবন্ধে গান্ধীজির ‘মহৎ চরিত্রে’-র উল্লেখকে জীবনীকার এক ‘অদ্ভুত অবাস্তব’ দ্বিধা বলেই মনে করেন, কারণ —

- “গান্ধীজির চরিত্রমাহাত্ম্যের কোন্ পরিচয় তিনি কোথায় পেলেন তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি।”[৩৫]
- “এই দ্বিধাই ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, এক অদ্ভুত সম্মোহনে অভিভূত হয়ে অন্ধভক্তি ও কুযুক্তিকে শিরোধার্য করে ভারত গান্ধীজি প্রবর্তিত একাধিক অপরিকল্পিত রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণামে এক খণ্ডিত প্রতিবন্ধী স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছিল এবং আজও তার ফল ভোগ করে চলেছে ও চলবে।”[৩৬]

জীবনীকারের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মূল্যায়নের স্পষ্ট উচ্চারণ এই মন্তব্যে।

আবার ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও আচরণের সমালোচনাতেও জীবনীকার সমান স্পষ্টবাদী, যা তাঁর স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। যেমন — “ ‘মা ভৈঃ’-এর মতো সুলভ আদর্শবাদের দ্বারা পিচ্ছিল, চিন্তার শৃঙ্খলাবিহীন, দুর্বল একটি রচনা লিখে রবীন্দ্রনাথ সেটিকে বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশযোগ্য বলে কী করে বিবেচনা করলেন, এ প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে। মনে হয়, উদ্বেগপীড়িত মনের অসুস্থ শিথিল ভাবনাপ্রবাহ থেকে রচনাটির উদ্ভব।”[৩৭] বা, প্রফুল্লময়ী দেবীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তিক্ত মনোভাব প্রসঙ্গে — “... রবীন্দ্রনাথ এখানে মানবিক সহানুভূতি হারিয়ে প্রফুল্লময়ী দেবীর উপর কিছুটা অবিচার করেছেন... মহর্ষির মৃত্যুর পর এই মাসোহারা পাওয়া গিয়েছে অবিবেচক ট্রাস্টীদের হাত থেকে, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন!”[৩৮]

এবার আসব ‘রবিজীবনী’র রসবৈদগ্ধ্যের প্রসঙ্গে। রাশভারি তথ্য-আবহের আড়ালে আপাতভাবে কিছুটা চাপা পড়ে গেলেও এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ, জীবনীর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা জীবনীকারের অসামান্য রসবোধের পরিচায়ক, নির্মল কৌতুকরসে জারিত সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যগুলি পাঠকের পক্ষে কোথাও dramatic relief এর মতোই কাজ করে। একনাগাড়ে

© Santiniketan Sahityapath

তথ্যভিত্তিক গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যে এই মন্তব্যগুলি মুহূর্তের অবকাশ সৃষ্টি করে কীভাবে পাঠককে নির্মল হাস্যরসে বিনোদিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরব —

- ক্যাশবই থেকে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি-পরিদর্শনে যাওয়ার আয়োজন এবং 'যেতে নাহি দিব' কবিতার কথকের যাত্রার আয়োজন পাশাপাশি রেখে জীবনীকার দেখান — "কবিতাটির প্রথমাংশ তো রবীন্দ্রজীবনের বাস্তব বর্ণনা"। তারপরেই তাঁর কৌতুক-সরস মন্তব্য — "পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই তালিকার মধ্যে স্ত্রীর সহস্তরচিত 'দুটি কুমড়ার বড়ি'র স্থান সংকুলান ক'রে দেবার অন্তত দু'বার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু 'গুড়ের পাটালি' ও 'কিছু ঝুনা নারিকেলে'-এর দৌরাত্ম্যে তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয় নি!"[৩৯]

- সাধনা সম্পাদনার চাপে বিব্রত রবীন্দ্রনাথের ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রাংশ (পত্র ১৮৫ ও ১৮৬, ছিন্নপত্রাবলী) উদ্ধৃত করে জীবনীকারের মন্তব্য — ১৮৫ নং পত্রের "গুঞ্জনটুকু দিন-কুড়ির মধ্যেই আর্তনাদে পরিণত হয়েছে" এবং পত্র ১৮৬ র আশঙ্কা সত্যি করে — "Sanity বেশি দিন তিনি বজায় রাখতে পারেন নি, মাস-আষ্টেক পরেই তিনি সম্পাদকত্ব ও সঙ্গো সঙ্গো সাধনা-র অপমৃত্যু ঘটান।"[৪০]

- ক্যাশবইয়ে উল্লেখিত জামাইষষ্ঠীর খরচ প্রসঙ্গো জীবনীকারের satirical মন্তব্য — "... ব্যয়ের অঙ্ক দেখে আধুনিক শ্বশুরগণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে পারেন! অবশ্য তাঁরা আশ্বস্ত হতে পারেন এই জেনে যে, রবীন্দ্রনাথের জামাতাগণ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁকে দোহন করার কোনো সুযোগের অপব্যবহার করেন নি!"[৪১]

- ক্যাশবইয়ের ঘোড়ার গাড়ির ভাড়ার হিসেব সূত্রে রবীন্দ্র-গতিবিধির নাগাল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁর সরস আক্ষেপ — "দেশে ফিরেই রথীন্দ্রনাথ একটি মোটরগাড়ি কেনেন। এর ফলে তাঁর ও পরিবারের সুবিধা হলেও জীবনীকারের কিছু অসুবিধা হয়েছে।"[৪২]

- ১৯১৬র জাপান-সফরে কোবে বন্দরে জাপানী ও প্রবাসী-ভারতীয় ভক্তদল এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রায় আক্ষরিক অর্থেই যে টানাটানি আরম্ভ হয়, তার প্রেক্ষিতে জীবনীকারের কৌতুককর মন্তব্য — "বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন ও এই মানুষের সাইক্লোনের মধ্যে বাছাই করতে হলে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে প্রথমটিকেই পছন্দ করতেন!"[৪৩]

'রবিজীবনী'তে আরো একভাবে পাঠক ও জীবনীকারের মধ্যে সরাসরি যোগ স্থাপিত হতে দেখি, যার ফলে প্রশান্তকুমারের স্বভাবসিদ্ধ উপস্থাপনভঙ্গি জনিত নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্তির ব্যবধান অনেকখানি কমে আসে। কখনো তিনি নিজ পাঠকসত্তার ব্যক্তিগত রসানুভব ভাগ করে নেন তাঁর গ্রন্থ-পাঠকদের সঙ্গো —

- "রবীন্দ্রনাথের কথায় পূর্ণ" স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাজিপুর পত্র' থেকে উদ্ধৃতি-প্রসঙ্গো — "উদ্ধৃতিটি সুদীর্ঘ, কিন্তু বর্ণনার সজীবতা ও সরসতায় আশা করি পাঠকও শ্রান্তি বোধ করেন নি!"[৪৪]

- 'স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র এগারো দিন আগে' রবীন্দ্রনাথের কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা চিঠি (২৭ কার্তিক, ১৩০৯) তে গায়ত্রী মন্ত্র ও শান্তিনিকেতনের আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গো — "পাঠককে মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গো এই পত্রটি পড়ে নিতে অনুরোধ করি।"[৪৫]

আবার বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকের কাছে জীবনীকার অনুরোধ রাখেন তথ্য-যোগান দেওয়ার —

- ১৯ আশ্বিন, ১৩০০ তারিখে রবীন্দ্র-লিখিত পত্রের অজ্ঞাত প্রাপক সম্বন্ধে — "এই ব্যক্তির পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পারি নি, পাঠকেরা যদি পারেন এই আশায় পত্রটি উদ্ধৃত করছি।"[৪৬]

- রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর সম্পর্ক প্রসঙ্গো — "... উভয়ের ঘনিষ্ঠতার ইতিবৃত্তটি তথ্যাভাবে ধূসর...

© Santiniketan Sahityapath

পাঠকেরা কি কিছু উপাদান সরবরাহ করতে পারেন?”[৪৭]

- ইউরোপ-সফর পর্বে (১৩২০ বঙ্গাব্দে) বিদেশী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার অপূর্ণাঙ্গ সূচি প্রসঙ্গে — “আশা করি, বিদেশে অবস্থানকারী রবীন্দ্রানুরাগীরা তথ্যসংগ্রহ করে দিয়ে এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে সাহায্য করবেন।”[৪৮]

এভাবেই দেখা যায়, বিশ্লেষণধর্মী ‘রবীন্দ্রজীবনী’র তথ্যের ঘাটতি পূরণের তাগিদ থেকে জন্ম নেওয়া ‘রবিজীবনী’ জীবনীকারের প্রয়াণজনিত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে অতি সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছেছে তো অবশ্যই, কিন্তু শেষপর্যন্ত নিছক তথ্যকেন্দ্রিকতার যান্ত্রিকতাতেই বন্ধ হয়ে থাকেনি। বিভিন্ন খণ্ডের মুখবন্ধে তথ্যেই সীমিত থাকার কঠোর নৈর্ব্যক্তিক নীতি ঘোষণা তথা জীবনীকারের সচেতন তত্ত্বগত আদর্শ নির্ধারণ তথা methodology র এক অভিনব প্রতিমান সৃষ্টি বাংলা জীবনীসাহিত্যের ইতিহাসে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, কার্যক্ষেত্রে স্থানে স্থানে রবীন্দ্র-জীবন-দর্শন -সাহিত্যের গভীরতায় ডুব দেওয়া মরমী রসজ্ঞ প্রশান্তকুমারের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নিজনীতি-বিরুদ্ধভাবেই, এই গ্রন্থটির একটি যথার্থ পূর্ণাঙ্গ ‘রবীন্দ্রজীবনী’ হয়ে ওঠার পক্ষে ততখানিই অপরিহার্য উপাদান। তাই, দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনী হিসেবে ‘রবিজীবনী’কে সঠিকভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করতে গেলে, এর প্রতি যথার্থ সুবিচার করতে গেলে আমাদের তথ্যসাধক প্রশান্তকুমার পালের পাশাপাশি সমগুরুত্বে সচেতন নজর দিতে হবে তথ্যরাশির ফল্গুস্রোতে বহমান এই আপাত-অচেনা, অনুভবী-রসগ্রাহী-মানবিক গুণে উদ্ভাসিত এবং সর্বোপরি তথ্যকে ছাপিয়ে প্রকৃত সত্যসন্ধানী হয়ে উঠতে পারা অন্তর্মুখী প্রশান্তকুমারকেও। এই প্রচেষ্টায় সামান্যতম সহায়তা করে উঠতে পারাতেই বর্তমান নিবন্ধের সকল সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১। ‘রবিজীবনী’১ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮২), মুখবন্ধ

২। ‘রবিজীবনী’২য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুআরি ১৯৯০ (প্রথম প্রকাশ অগস্ট ১৯৮৪), পৃ. ৬৪

৩। ‘রবিজীবনী’ ১ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮২), মুখবন্ধ

৪। ‘রবিজীবনী’ ৩য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ১৮১

৫। ওই, পৃ. ১৮৮

৬। ওই, পৃ. ২৯২

৭। ‘রবিজীবনী’৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ১৯৯৩, পৃ. ১০১

৮। ‘রবিজীবনী’, ১ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮২), মুখবন্ধ

৯। ‘রবিজীবনী’ ৪র্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, মুখবন্ধ

১০। ওই

১১। ‘রবিজীবনী’ ১ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮২), পৃ. ২৮১-৮২

১২। ‘রবিজীবনী’ ২য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুআরি ১৯৯০ (প্রথম প্রকাশ অগস্ট ১৯৮৪), পৃ. ৭৫

১৩। ওই

© Santiniketan Sahityapath

১৪। ওই, পৃ. ১৩১

১৫। ‘রবিজীবনী’ ১ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮২), পৃ. ২২৩-২২৪

১৬। ‘রবিজীবনী’ ৩য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ৩২

১৭। ‘রবিজীবনী’ ১ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮২), পৃ. ২৭০

১৮। ‘রবিজীবনী’ ৩য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ১৮৪

১৯। ওই

২০। ওই, পৃ. ১৮৫

২১। ওই, পৃ. ১৩৫

২২। ‘রবিজীবনী’ ৪র্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ১৯০

২৩। ‘রবিজীবনী’ ২য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুআরি ১৯৯০ (প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৪), পৃ. ৪৭

২৪। ওই, পৃ. ১৩০

২৫। ‘রবিজীবনী’ ৪র্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ১৩

২৬। ‘রবিজীবনী’ ৫ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৩৭০-৭১

২৭। ‘রবিজীবনী’ ৪র্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ৭৫

২৮। ‘রবিজীবনী’ ৩য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ২২১

২৯। ওই, পৃ. ২৭২

৩০। ওই

৩১। ‘রবিজীবনী’ ৪র্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ১৮৮

৩২। ‘রবিজীবনী’ ২য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুআরি ১৯৯০ (প্রথম প্রকাশ অগস্ট ১৯৮৪), পৃ. ২২২-২৩

৩৩। ‘রবিজীবনী’ ৪র্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ১৮৪

৩৪। ‘রবিজীবনী’ ৯বম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৩, পৃ. ২৩৩

৩৫। ওই

৩৬। ওই

৩৭। ‘রবিজীবনী’ ৫ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৯১

৩৮। ‘রবিজীবনী’ ৪র্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ২৪৯

৩৯। 'রবিজীবনী' ৩য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ২৩৫
৪০। 'রবিজীবনী' ৪র্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ৪১
৪১। 'রবিজীবনী' ৫ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৮৯
৪২। 'রবিজীবনী' ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ১৯৯৩, পৃ. ৪৮৩
৪৩। 'রবিজীবনী' ৭ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭, পৃ. ১৭৮
৪৪। 'রবিজীবনী' ৩য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাত, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ৯৯
৪৫। 'রবিজীবনী' ৫ম খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৯৪
৪৬। 'রবিজীবনী' ৩য় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ২৭৮
৪৭। 'রবিজীবনী' ৪র্থ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ২৯২
৪৮। 'রবিজীবনী' ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ১৯৯৩, পৃ. ৪৭৮

© Santiniketan Sahityapath